Beta
বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী
সোমবার| ফেব্রুয়ারি ০৩, ২০২০| ২১মাঘ১৪২৬

সম্পাদকীয়

আলোকপাত

পানি ব্যবস্থাপনার সরেজমিন অভিজ্ঞতা

ড. শামসুল আলম

জাতীয় উন্নয়নে জলবায়ু পরিবর্তনের পটভূমিতে দুর্যোগ মোকাবেলা, পরিবেশ ও প্রতিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা, কৃষিভূমির ব্যবহার এবং সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর ক্ষতিকর প্রভাবের দিক দিয়ে বিশেষভাবে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলগুলো খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০-তে এ ঝুঁকি মোকাবেলার বিষয়টি অত্যন্ত তাত্পর্যের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা ও সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনের জন্য সম্প্রতি এ নিবন্ধের লেখকের নেতৃত্বে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের একটি দল খুলনা জেলার ডুমুরিয়া ও বটিয়াঘাটা উপজেলা এবং সাতক্ষীরার সদর উপজেলায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের 'ক্লু-গোল্ড প্রোগ্রামের' কার্যক্রম বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়ে মাঠপর্যায়ে কৃষকদের সমস্যাবলি স্বচক্ষে দেখে। বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০-তে অন্তর্নিহিত উপকূলীয় অঞ্চলের পানি ব্যবস্থাপনা কৌশলগুলো বাস্তবায়ন ও ক্লু-গোল্ড প্রোগ্রামের মাধ্যমে বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বাস্তবায়িত সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমগুলো কীভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং আমাদের জন্য শিক্ষণ কী, সে বিষয়ে আলোকপাত করছি।

ক্লু-গোল্ড কর্মসূচি বিষয়ে কিছু আলোকপাত করার আগে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি, বিশেষ করে তাপমাত্রা বৃদ্ধি, বৃষ্টিপাত, সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রভাব ও বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনায় বিধৃত উপকূলীয় অঞ্চলগুলোর কৌশল ও প্রধান প্রধান কার্যক্রম নিয়ে প্রথমে কিছু কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি এবং বদ্বীপপ্রধান অঞ্চল হওয়ার কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জের (আইপিসিসি প্রতিবেদন-৫) তথ্যানুযায়ী বিশ্বের ১০টি দুর্যোগপ্রবণ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ একটি। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, খরা, বন্যা, নদীভাঙন আমাদের নিত্যসঙ্গী। এর সঙ্গে রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি। আগামী দশকগুলোয় বৈজ্ঞানিক তথ্য-উপাত্তে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ইত্যাদির জন্য বন্যা, খরা, সাইক্লোন, লবণাক্ততা—এগুলোর ঝুঁকি বৃদ্ধির জোরালো পূর্বাভাস রয়েছে। তাছাড়া প্রয়োজনীয় পরিবেশগত সুরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া দ্রুত অপরিকল্পিত নগরায়ন এবং গ্রামায়ন ও শিল্প উন্নয়নের কারণে পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার ওপর ক্রমে চাপ বাড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করা এবং দেশের টেকসই উন্নয়নের ধারা বজায় রাখা এ মুহূর্তে বড় চ্যালেঞ্জ। এ বাস্তবতায় পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত চ্যালেঞ্জগুলো বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নকে সহায়তার জন্য প্রণীত হয়েছে বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০।

বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ একটি কারিগরি অর্থনৈতিক, বহুমুখী এবং দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত মহাপরিকল্পনা। জলবায়ু পরিবর্তন ও তার ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০-তে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তাছাড়া পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ ও পরিবেশবিষয়ক লক্ষ্যমাত্রাগুলোকে এ পরিকল্পনায় আরো সময়ভিত্তিক সুনির্দিষ্টকরণ করা হয়েছে।

গত পাঁচ দশকে ঢাকা শহরের তাপমাত্রা বেড়েছে ১ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অর্ধেক কমেছে। ১৯৭১ সালে ঢাকা শহরের বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ছিল ২৫ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, তা ২০১৬ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৬ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অর্থাৎ গত ৪৫ বছরে ঢাকা শহরের গড় তাপমাত্রা বেড়েছে ১ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অন্যদিকে ১৯৭১ সালে ঢাকা শহরের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ছিল ৬৪০ মিলিমিটার, যা ২০১৬ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ৩৭০ মিলিমিটারে। পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা এরই মধ্যে প্রাক-শিল্প বিপ্লবের চেয়ে প্রায় এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের ওপর পৌঁছেছে। ২০১৮ সাল মানবেতিহাসের সবচেয়ে উষ্ণতম বছর ছিল। এটা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কতটা প্রকট হচ্ছে। তাছাড়া বাংলাদেশের উপকূলে গত দুই দশকেই সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রায় চার মিলিমিটার বেড়েছে। যদি বর্তমান হারে তাপমাত্রা বাড়তে থাকে, তাহলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে আমাদের ১৯টি উপকূলীয় জেলা স্থায়ীভাবে জলমগ্ন হতে পারে। ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ১৪ শতাংশ এলাকা স্থায়ীভাবে বন্যা প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে সাইক্লোনের মাত্রা ও গতি ৫ থেকে ১০ শতাংশ বাড়তে পারে। এসবের প্রভাবে দেশের অধিকাংশ খাত প্রভাবিত হয়ে সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির ক্ষতিসাধন করবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের আরেকটি ঝুঁকিপূর্ণ খাত হচ্ছে বনাঞ্চল ও প্রতিবেশ। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা, উচ্চতাপমাত্রা ও ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা বৃদ্ধির ফলে দেশের বনসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, জলবায়ু সংবেদনশীল অনেক প্রজাতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে এবং অনেক উঁচু বনভূমি এলাকায় মাটি ক্ষয় ও এর গুণগত মান হ্রাস পাচ্ছে। বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন, সুন্দরবন জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে লোনা পানির অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা বন ও এর বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রতিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এক মিটার সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশে স্থলভূমির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ স্থায়ীভাবে প্লাবিত হবে। জমির পরিমাণে আশঙ্কাজনক ঘাটতির কারণে অর্থনীতির সব খাতে উৎপাদন হ্রাস পাবে এবং প্রকৃত জিডিপিতে অবনমন ঘটবে।

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় এবং তার সঙ্গে জলোচ্ছ্বাস যেমন বাড়তে থাকবে, তেমনি নদীগুলোর উচ্চপ্রবাহ ও অনিয়মিত বৃষ্টিপাত ক্রমে উপকূলীয় বদ্বীপে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার ওপর বিশাল চাপ সৃষ্টি করছে। নদী ভরাট হয়ে যাওয়া, নদীপ্রবাহের পরিবর্তন ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ভবিষ্যতে উপকূলীয় অঞ্চলের আর্থসামাজিক অবস্থার ওপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করবে।

বদ্বীপ পরিকল্পনায় উপকূলীয় অঞ্চলে বিদ্যমান পোল্ডারের কার্যকর ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি, উপকূলীয় অঞ্চলে নতুন জমি পুনরুদ্ধারসহ বেশকিছু বিষয়ে কার্যকর কৌশল ও কার্যক্রমের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ-সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হচ্ছে: ১. উপকূলবর্তী সাতটি পোল্ডারে পলি সংগ্রহে জোয়ার-ভাটা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; ২. স্থানীয় পর্যায়ে লবণাক্ততা বিষয়ে পূর্বসতর্কীকরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা; ৩. সুন্দরবন অঞ্চলে ঘসিয়াখালী চ্যানেলসহ অন্যান্য চ্যানেলে নিয়মিত ড্রেজিং কার্যক্রম গ্রহণ; ৪. সুন্দরবনের উন্নয়ন, কৃত্রিম ম্যানগ্রোভ বন সৃষ্টি, সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা, দ্বীপগুলোর উন্নয়ন ও নতুন জেগে ওঠা জমিতে ৫০০ মিটার পর্যন্ত ম্যানগ্রোভ প্রজাতির বনায়ন ত্বরান্বিতকরণ। বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০-তে উপকূলীয় অঞ্চলের এসব সমস্যা সমাধানে নদীর জোয়ার-ভাটার ব্যবস্থাপনায় অধিকতর দক্ষতা আনার সুপারিশ করা হয়েছে। কেউ কেউ হয়তো পোল্ডার ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন। দেশে বেশকিছু পোল্ডার কিংবা বন্যা নিরোধক বাঁধ ও সেচ ব্যবস্থার সফলতা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ নলেরচর পোল্ডার ব্যবস্থা ও মতলব-ধনাগোদা বন্যা নিরোধক সেচ ব্যবস্থা। এসব পোল্ডারের অভ্যন্তরে বিন্যাসিত সড়ক ব্যবস্থা, কৃষি ব্যবস্থা ও স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব বন্যা কর্ডন ব্যবস্থার কারণে অন্যত্র নদীভাঙন দেখা দিলে তা পরিকল্পিত ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে মোকাবেলা করা যায়।

এবার ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের কথায় আসা যাক। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রামের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে খুলনা, সাতক্ষীরা, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার নির্বাচিত পোল্ডারগুলোর সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং টেকসই আর্থসামাজিক উন্নয়ন। ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রামে মোট পোল্ডার সংখ্যা ২২টি এবং আয়তন ১ লাখ ১৫ হাজার হেক্টর। প্রোগ্রামটি বাংলাদেশ সরকার ও নেদারল্যান্ডস সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় বাস্তবায়ন হচ্ছে। পানিসম্পদসংশ্লিষ্ট সবার মতামতের ভিত্তিতে অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম প্রবর্তনের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা এ প্রোগ্রামের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য। ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রামের মাধ্যমে পোল্ডার এলাকার পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো, যেমন বেড়িবাঁধ সংস্কার, স্লুইস গেট নির্মাণ/সংস্কার, ইনলেট ও আউটলেট নির্মাণ/সংস্কার এবং খাল পুনঃখননের কাজ করছে, যাতে এর মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূর হয়, কৃষি উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রামের অন্যতম আরো একটি কাজ হচ্ছে পোল্ডার এলাকায় অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গড়ে তোলা। এর উদ্দেশ্য স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠন করা, যাতে তারা পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, স্লুইস গেট ব্যবস্থাপনা ও নিয়মিত পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করে অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শস্য বহুমুখীকরণ, শুষ্ক মৌসুমে অধিক জমিতে চাষাবাদ করে কৃষি উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি করতে পারে। সাংগঠনিকভাবে দলীয় কাজে অংশগ্রহণ ও পারস্পরিক শিখন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভালো কাজ দ্রুত সম্প্রসারণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাসহ স্থানীয় সরকার এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে ‘কার্যকর পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করাই সংগঠনের মূল কাজ।’

পানি সংগঠনের নিয়ম অনুযায়ী পোল্ডার এলাকায় একই ধরনের পানিপ্রবাহ ও নিষ্কাশন এলাকা এবং গ্রামের প্রশাসনিক সীমানাভিত্তিক ক্যাচমেট/সাব-ক্যাচমেট অনুযায়ী প্রয়োজনীয়সংখ্যক পানি ব্যবস্থাপনা দল ও

অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়। পানি ব্যবস্থাপনা দল ও অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত হয়। প্রতিটি পানি ব্যবস্থাপনা দল গঠনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার মোট পরিবারের কমপক্ষে ৫৫ শতাংশ পরিবারের প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে এবং দলের মোট সদস্যের কমপক্ষে ৪০ শতাংশ নারী সদস্য থাকবে। প্রতিটি পানি ব্যবস্থাপনা দলের ব্যবস্থাপনা কমিটি হবে ১২ সদস্যবিশিষ্ট, যারা ওই সংগঠনের সাধারণ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। অন্যদিকে প্রতিটি দলের ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক মনোনীত চারজন সদস্য নিয়ে পানি ব্যবস্থাপনা অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ কমিটি গঠিত হবে। পানি ব্যবস্থাপনা দলের ক্ষেত্রে নিজ নিজ এলাকার ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য এবং অ্যাসোসিয়েশনের ক্ষেত্রে ইউপি চেয়ারম্যান উপদেষ্টা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকেন। পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন পোল্ডার এলাকায় সেচের জন্য উন্নত পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করে। স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি এবং তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ সৃষ্টিতে যৌথ কার্যক্রম অন্যতম প্রধান বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়।

কৃষিকাজ হচ্ছে পোল্ডারে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর প্রধান জীবিকা এবং আয়ের উৎস। সঠিক পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে পারিবারিকভাবে ভোগের পাশাপাশি বাড়তি পণ্য বিক্রি করে অধিক আয়ের সুযোগ আছে। ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম কৃষকদের কৃষি উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির জন্য বাজার সংযোগ বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করে। সেচের জন্য পানিসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এতে অধিক হারে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। কৃষকের পণ্যের চাহিদা নিরূপণ করে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে অধিকতর লাভজনক সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে কৃষক তার উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করে অধিক লাভ করছেন। ফলে দারিদ্র্য হ্রাস ও জীবনমানের উন্নয়ন হচ্ছে। বাজারে যে ধরনের পণ্যের চাহিদা আছে, সেই পণ্যের উৎপাদন ও ভালো মানের পণ্যের বাজারজাতের ফলে কৃষক অধিক মুনাফা নিশ্চিত করতে পারেন। ব্লু-গোল্ড এ লক্ষ্য অর্জনে কৃষক মাঠ স্কুল গঠন ও পরিচালনা করে। শস্য, মত্স্য ও প্রাণিসম্পদের ওপর কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ চালিত কৃষক মাঠ স্কুল গঠন করে আধুনিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বৃদ্ধি, পুষ্টির চাহিদা মেটানো ও বাজার সংযোগ বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট থাকে। কৃষক মাঠ স্কুল থেকে অর্জিত জ্ঞান পারস্পরিক শিখনের মাধ্যমে অন্যদের কাছে পৌঁছানো হচ্ছে, যেন সবাই এর সুফল পেতে পারেন। কৃষি উৎপাদনে পানি ব্যবস্থাপনার এ সাফল্য প্রকল্প এলাকাগুলোয় কৃষকের মুখে হাসি ফুটিয়েছে।

পরিদর্শন করা মোট চারটি পোল্ডারে ক্যাচমেন্ট এরিয়া ৩৮টি, মোট পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন সাতটি এবং পানি ব্যবস্থাপনা দলের সংখ্যা হচ্ছে ১৫৯, মোট খানার সংখ্যা ৭১ হাজার ৭১৯, মোট পানি ব্যবস্থাপনার দলের সদস্য সংখ্যা ৫০ হাজার ২১০। সঞ্চয় কর্মসূচিতে ১৫৯টি পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যদের সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ ১ লাখ ১২ হাজার ৩৩৫ টাকা। যেখানে স্লুইস ও সেচ নালা সংরক্ষণ এবং মেরামতের জন্য ব্যয় রাখা হয়েছে ৯ লাখ ৪৯ হাজার ৬০০ টাকা। উল্লেখ্য, কিছু কিছু পানি ব্যবস্থাপনা দলের ব্যয়ের চেয়ে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ বেশি, যেমন পোল্ডার ২৬ ও পোল্ডার ২ এবং এক্সটেনশন ২। এখানে এটা স্পষ্ট যে, পানি ব্যবস্থাপনা দলগুলো তাদের নিজেদের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে পোল্ডার ব্যবস্থাপনা সংরক্ষণ ও মেরামতের কাজ সম্পন্ন করতে পারে, যা খুবই আশাব্যঞ্জক প্রতীয়মান হয়েছে আমাদের পরিদর্শক দলের কাছে। উপকারভোগীদের অংশগ্রহণ না থাকায় সংরক্ষণ ও মেরামতের অভাবেই এখনো বহু পোল্ডার অকেজো হয়ে গেছে।

সংশ্লিষ্ট উপকারভোগী ও অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা করে জানা গেছে যে ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রামের আওতায় পোল্ডার কার্যক্রম গ্রহণ করার ফলে তাদের কৃষি, মত্স্য, গবাদিপশুসহ অন্যান্য বিষয়ে অনেক উন্নয়ন হয়েছে। অবশ্য পোল্ডার ব্যবস্থাপনায় এখনো বেশকিছু সমস্যা রয়ে গেছে। উল্লেখযোগ্য সমস্যা হলো, পোল্ডারগুলোর উচ্চতা প্রয়োজনের তুলনায় কম, স্লুইস গেট সংস্কার, নদীতে পলি জমা, খননকৃত নদীতে ব্রিজ

না থাকায় যোগাযোগ সমস্যা, ধান চাষে আধুনিক পদ্ধতির কম ব্যবহার ইত্যাদি। উপকূলীয় অঞ্চলে আরেকটি প্রকট সমস্যা হলো জলাবদ্ধতা। অতিবৃষ্টি কিংবা নদীতে জোয়ার হলে প্রায়ই জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়, যা ফসলহানিসহ জনজীবনের অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করে। স্থানীয় অংশীজনদের সূত্রে জানা যায়, এ জলাবদ্ধতার অন্যতম কারণ নদীতে পলি জমা, প্রয়োজনীয় ও সময়মতো ড্রেজিং না করা এবং পোল্ডারের অভ্যন্তরে খালগুলোয় প্রভাবশালীদের বাঁধ দিয়ে মাছ চাষ করা। ঘের কিংবা মাছ চাষের মধ্য দিয়েই এ অঞ্চলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। জনযুক্তিতেই পোল্ডারের অভ্যন্তরে খালে বাঁধ দেয়া যাবে না, সেটা বিডিং চাষ কিংবা মাছ চাষ যা-ই হোক।

বটিয়াঘাটা ও ডুমুরিয়া উপজেলায় সংশ্লিষ্ট কয়েকটি ইউনিয়নের অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে জানা যায় যে প্রবহমান নদীতে বাঁধ দিয়ে মাছ চাষ করা বিশেষ করে জেলার অভ্যন্তরের সব খাল, ছোট নদী ও জলাশয় বাঁধের ইজারা বাতিল এবং সব নদী ও খালের অবৈধ দখল উচ্ছেদ করে পুনঃখননের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। তাদের মতে, স্থানীয় সরকারসহ জাতীয় সরকারের নীতিগত জোরালো সমর্থন ব্যতীত এগুলো পুনরুদ্ধার কঠিন বলে স্থানীয় কৃষক শ্রেণী মনে করে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কেউ কেউ এ দখলদারিত্বে জড়িত রয়েছে বলে অনেকে জানিয়েছেন। তাছাড়া নদীর উভয় তীর সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় বাঁধ তৈরিসহ পর্যটন এলাকা গড়ে তোলা এবং বনায়ন করা যেতে পারে।

ডাচ সহায়তায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রামটি একটি সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার রোল মডেল হিসেবে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে কাজ করে যাচ্ছে। এটিকে আদর্শ মডেল হিসেবে ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম বাস্তবায়নকাল-পরবর্তী সময়ে চালু রাখা প্রয়োজন। আর এজন্য সরকারি ও বেসরকারি সহযোগিতা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রামের আওতায় প্রতিষ্ঠিত পোল্ডারগুলোর কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং পোল্ডারগুলোর উচ্চতা বৃদ্ধি, প্রয়োজনীয় খননকাজ, স্লুইস গেটগুলোর সংস্কার ও ব্যবস্থাপনা, বাঁধগুলোর নবায়ন কার্যক্রম চালু করা, স্থানীয় পানি সংগঠনগুলো আরো গতিশীল করা অব্যাহত কৃষি উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। সুপেয় পানির ব্যবস্থা, পানি সংরক্ষণ হিসেবে বৃষ্টির পানি ধরে রাখা, লবণসহিষ্ণু ফসলের জাত প্রবর্তন জরুরিভাবে করণীয়। নদী, খাল যাতে দখল না হয়, সেদিকে স্থানীয় প্রশাসনসহ সব অংশীজনের একসঙ্গে কাজ করতে হবে। আরো যা প্রয়োজন, খাল-নদীগুলো খননের মাধ্যমে পানি চলাচল উন্মুক্ত রাখা, পোল্ডার থেকে অবৈধ বসতি উচ্ছেদ করা এবং কচুরিপানামুক্ত রাখা। আবর্জনা ফেলে নদী-খাল যেন কেউ ভরাট না করতে পারে, ভূমি মন্ত্রণালয়কে তা গভীর তদারকিতে রাখতে হবে।

ড. শামসুল আলম: সদস্য (সিনিয়র সচিব)

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন